দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

14

# আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

## কাজী সুফিয়া আখতার

৮ই সেপ্টেম্বর। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এবার বিপর্যয়কর বন্যার ফলে এই দিনে সভা-সেমিনার আলোচনা হয়ত সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু এ সত্তেও দিনটির তাৎপর্য আছে।

বিশ্বের তাবৎ মানুষকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার উপযোগী সাধারণ জ্ঞান, হিসাব ও শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধ করাই এই মহান দিবসটির উদ্দেশ্য।

সমস্যাসংকুল আমাদের এই দারিদ্রপীড়িত দেশে শিক্ষাও অন্যতম সমস্যা বৈ কি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমে জনগণ জনসাধারণ ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে 'গণ' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই হিসেবে এই কয়েক বৎসরে 'গণশিক্ষা' কথাটি বেশ প্রচলিত হয়েছে। তবে গণশিক্ষা আজও সেই তিমিরেই আছে।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যা ঃ ১০ কোটি ৭২ লাখ ১১ হাজার। তার মধ্যে পাঁচ বছর বয়সী ঃ ১ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার। পাঁচ বছরের ঊর্ধ্বে ঃ ৯ কোটি ৩৩ লাখ ৩১ হাজার। গড় আয়ু ৫৫ বৎসর। সাক্ষরের সংখ্যা ২ কোটি ২২ লাখ ১০ হাজার। শতকরা হিসেবে শিক্ষার হার ২৩.৮%। নিরক্ষর ঃ ৭ কোটি ১১ লাখ ৯৮ হাজার—শতকরা হিসেবে ৭৬.২%।

এসএসসি, দাখিল ও সমমানের শিক্ষিত জনসংখ্যা ঃ ৩৫ লাখ ৬৬ হাজার—শতকরা হিসেবে ৩.৮২%।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারির সংজ্ঞা অনুসারে যে ব্যক্তি বাংলা, ইংরেজী, উর্দু ও আরবী এই চার ভাষার যে কোনো একটিতে লেখা সহজ চিঠি পড়তে ও লিখনে সক্ষম—তিনিই সাক্ষর। পরে এই সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে দৈনন্দিন হিসেব জ্ঞানের বিষয়টি। দৈনন্দিন জীবনে পর্যাপ্ত ব্যবহারোপযোগী পঠন, লিখন ও গণনার ক্ষমতা অর্জন।

জাতিসংঘের শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সংজ্ঞা অনুসারে যে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত সহজ বিবরণ পড়ে বুঝতে পারেন তিনিই সাক্ষর। এই দুই সংজ্ঞা অনুযায়ীই আমাদের দেশের সাক্ষরের সংখ্যা হার শতকরা ২৩.৮ ভাগ। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের ২৬(ক) নং ধারায় বলা হয়েছে—প্রত্যেকেই শিক্ষার আলো লাভের অধিকারী। বিনা খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সব না হলেও অন্তত মৌখিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা টুকু যাতে সবাই বিনা খরচে পেতে পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সাধারণভাবে সবার গ্রহণের আওতায় আনতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার দ্বার মেধার ভিত্তিতে সবার জন্যে উন্মুক্ত রাখতে হবে।

আমাদের দেশে এই শিক্ষাদানের কার্যক্রম যে চালু করা হয়নি, এমন নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনকভাবে সত্যি দেশের পাঁচ থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের তিন ভাগের এক ভাগ আজও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে কখনও পা দেয়নি। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই এ খবর জানেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যে আজো কার্যকর করা যায়নি, এটা নিঃসন্দেহ সত্য। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর হার বেশী হবার কারণ আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও সীমাহীন দারিদ্র্য। শিক্ষা সামগ্রীর উচ্চমূল্য, অনিয়মিত বই বিতরণ শিক্ষাদানে যেমন, শিক্ষক ও অভিভাবককে তেমনি শিক্ষা গ্রহণেও শিক্ষার্থীদের মনে অনীহার জন্ম দেয়। তাছাড়া দারিদ্রের চাপে পড়ে গ্রামের অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী তাদের ইচ্ছা থাকা সত্তেও পিতামাতার পেশায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। শহরেও বিভিন্ন ধরনের নিম্নমানের পেশায় তারা নিয়োজিত রয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৪৭ দশমিক ১১ ভাগ শিশু তাদের পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে কাজ করে এবং শতকরা ৮১ দশমিক ৮৮ জন শিশু শ্রমিক তাদের বাবা-মাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে থাকে। তাদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন শিশুর বয়স ৬ থেকে ৮ বৎসর। শতকরা ২৫ দশমিক ৩৭ ভাগের দৈনিক কাজের সময় ১০ থেকে ১২ ঘন্টা এবং মাসিক আয় ১০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৩ লক্ষ শিশুশ্রমিক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কেঁপে অর্থ উপার্জন করে। সুতরাং শতকরা ৭৬ দশমিক ২ ভাগ শিশু-কিশোর কোনদিন বিদ্যালয়ে পাঠের আনন্দ লাভ করেনি।

দেশের মানুষই দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর পক্ষে এটা করা কখনও সম্ভব নয়। শিক্ষার আলো এবং সাক্ষরতার প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে অপরিসীম। তবে প্রথাবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই বিপুল-সংখ্যক মানুষকে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব নয়। প্রথাবহির্ভূত ও প্রথাবদ্ধ উভয় প্রকার ক্ষেত্রেই পরিবেশকেন্দ্রিক ও জীবনানুসারী শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। পরিবেশকে যুগোপযোগী করে উন্নত করে তুলতে হবে।

আজকের সামাজিক পরিবেশ বিদ্যাকে বিমুক্তির পথ না ভেবে তথ্যোপার্জনের মাধ্যম ভাবার ফলে শিক্ষার্থীর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আনন্দকে বাদ দিয়ে পড়ালেখা করতে এসে প্রতিনিয়ত সে পরিণত হচ্ছে একটি যন্ত্রে। শিক্ষার সাঙ্গীকরণ হচ্ছে না বলে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে চরম সংকট ও নৈরাজ্য। দেশের অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে হলে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার খুব প্রয়োজন। সে জন্যে দরকার গণশিক্ষাতে মনস্তত্ত্বের ভূমিকাকে উপেক্ষা না করা। সদ্য সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্যে সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলো লেখা এবং পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে তাদের মধ্যে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করা। প্রচলিত ডাকের বচন, খনার বচনের সাহায্যে কৃষিশিক্ষা, গৃহস্থালি ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির নিয়মাবলী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে করে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয়গুলো সহজে বুঝতে সুবিধা হবে এবং মনে থাকবে।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজের নানাস্তরের মানুষ এই বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন। সরকারী এবং বেসরকারী কয়েকটি সংস্থা এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের কার্যক্রম চালাচ্ছেন, এটা সুখের বিষয়। কিন্তু কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও অধিকতর সমন্বয় সাধন করা ও সহজ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা আশু প্রয়োজন।